Bmjvg A_bxwZ : kvwš I mgw×i Ae¨_ e¨e¯v

[evsjv]

الاقتصاد الإسلامي : نظام متكامل يضمن تحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية الشاملة

[اللغة البنغالية]

Avjx nvmvb ^Zqe

علي حسن طيب

m¤úv`bv : W. gnv¤§` kvgmyj nK wmwÏK

مراجعة: د. محمد شمس الحق صديق

Bmjvg cPvi e¨¡iv, ivejqvn, wiqv`

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

2008 -1429

Bmjwg A_bxwZ : kwš I mgw×i Ae¨_ e¨e¯v

A_bxwZ :

মানুষ তার মৌলিক ও সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে, জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক উপকরণাদি যোগাতে নিজের চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। সে একাই তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর সবকিছু সংগ্রহ করতে পারে না, বরং এ ব্যাপারে সমাজের সবাই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের ব্যয়িত এ চেষ্টা অপরের জীবনোপকরণ লাভের জন্যও অপরিহার্য। জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর নিমিত্তে পরিচালিত মানুষের তাবৎ সক্রিয়তা ও তৎপরতাকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে। আর মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই সে বিবিধ তৎপরতা বিশেষত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বেলায় অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। বরং এজন্য তাকে এমন পন্থা ও নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয় যা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিৎ করে। সমাজে ব্যক্তির তৎপরতা সম্পর্কে যেসব নীতি ও নির্দেশ সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিৎ করে তাই অর্থনীতি নামে স্বীকৃত।

Bmjwg A_bxwZ:

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, সর্ববিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করাই যখন ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই খুব স্বাভাবিক যে, ইসলামেও মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এমন কিছু নিয়ম-নীতি থাকবে যা তার মৌল চেতনা ও আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। আর এ সব নিয়ম-নীতির ওপর গড়ে ওঠা ব্যবস্থাই ইসলামি অর্থনীতির রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তিমূল ইসলামি আকিদাসমূহ। একে কেন্দ্র করেই তার বিকাশ ও বিস্তৃতি। এসব আকিদাই হল ইসলামি অর্থনীতির মৌল চেতনা। যা মানব-প্রকৃতি, তার সুকুমার বৃত্তি ও পরিশীলিত চরিত্র রক্ষায় সাহায্য করে। পূরণ করে ব্যক্তির জীবন ধারণের জরুরি প্রয়োজনসমূহ। এসবই কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য ও চেতনাকে কেন্দ্র করেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাধারণ নীতিমালা এবং আনুষঙ্গিক বিন্যাসের স্ফূরণ ও অনুবর্তন। এছাড়াও তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়-ব্যয়ের খাতও নির্ধারণ করে দেয়, যেন ইসলামি রাষ্ট্র ব্যক্তির সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে। নিশ্চিৎ করতে পারে সমাজের সার্বিক কল্যাণ। প্রথমে আমরা আলোচনা করব ইসলামি অর্থব্যবস্থার চৈন্তিক ভিত্তি বা মৌল চেতনা ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী, তারপর তার সাধারণ নীতিমালা এবং সবশেষে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার নিয়ে।

GK : Bmjwg A_bxwZi tgŠj tPZbv :

ইসলামি আকিদাসমূহই ইসলামি অর্থনীতির মৌল চেতনা বা চৈন্তিক ভিত্তি। এ আকিদা বা চেতনা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করে। জানিয়ে দেয় কোন মহৎ উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরন্তু সবিস্তারে বাতলে দেয় এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সম্ভাব্য পথগুলোও।

এ আকিদার দর্পণে মানুষ আলাহর সৃষ্টি বরং সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাকে সৃজন করা হয়েছে কেবল তাঁরই ইবাদত বা দাসত্ব করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না তাঁর প্রতি সজ্ঞান সমর্পণ ছাড়া। যে আনুগত্য ও সমর্পনের প্রকাশ ঘটবে নিজ আত্মা, আচরণ এবং ক্রিয়া-কর্মকে– যার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও আছে, সেভাবে পরিচালনের মাধ্যমে আলাহ তা'আলা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মর্মে ইসলামি অর্থব্যবস্থাও এভাবে কাজ করবে যে, মানুষকে যে লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে পৌঁছার পথগুলো যেন সহজ হয়। এ উদ্দেশ্য যখন সফল হবে অর্থাৎ ইবাদত করা সহজ হয়ে যাবে তখনই মানুষের অন্তর যথার্থভাবে পরিশুদ্ধ হবে। দুনিয়ার সাফল্যতো বটেই উপযুক্ত হবে সে আখেরাতে চরম সাফল্য লাভের।

একজন ঈমানদারের জন্য অন্তরে এ চেতনা-দর্শন সদা জাগরুক রাখা অপরিহার্য। কারণ এ চেতনাই তাকে বলে দিবে পৃথিবীতে তার আসল চাওয়া কী, পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী এবং কী-ই বা তার লক্ষ্য এ বসুন্ধরায়। এ চেতনায় বলীয়ান হয়েই সে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের বেলায় হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে ইসলাম আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ। এভাবেই ইসলামি অর্থনীতির সুপ্রভাব প্রতিফলিত হয় মানুষের বাস্তব জীবনে আর তা ভূমিকা রাখে মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে।

আকিদা ও তার যেসব আনুষঙ্গিক বিষয় অর্থনীতির সঙ্গে সংশিষ্ট নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো–

c_gZ : mewKQi mË I gwjKvbv Avjvni :

প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত সবকিছু কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই একমাত্র আলাহ তা'আলার মালিকানাধীন। এর কোনো অণু সৃষ্টিতেও কেউ তাঁর অংশীদার নয়। একমাত্র আলাহ তা'আলাই এসবের স্রষ্টা। আলাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– (ক) আর আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আলাহর জন্যই।[১] (খ) আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আলাহরই।[২] (গ) এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই।[৩] (ঘ) বল, 'তোমরা আলাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই।[৪]

তাই নিখিল জগতের সবকিছুতেই যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ এখতিয়ার কেবল তাঁর জন্য সংরক্ষিত। কারণ পূর্ণ মালিকানার অধিকারী হওয়ার অর্থই হলো পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁর।

wØZxqZ : gvj ev m¤ú` me Avjvni :

মাল বা সম্পদ ওই সুরক্ষিত বস্তু মানুষ যা আহরণ করে এবং তা থেকে উপকৃত হয়। পৃথিবীস্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর সবই একমাত্র আলাহর। আলাহই সবকিছুর আসল মালিক। আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এবং আলাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও।[৫]

ZZxqZ : Avjvn ZvÔAvjv mKj gvLjK‡K gvb‡li AbMZ ewb‡q‡Qb :

আলাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সবকিছুকে মানুষের উপকারের জন্য তাদের অনুগত বানিয়েছেন। এবং এসব সৃষ্টি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে তাদের লাভবান হওয়ার বিভিন্ন রাস্তা খুলে দিয়েছেন। আলাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন– আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।[৬] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আলাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিআমত ব্যাপক করে দিয়েছেন।[৭] আলাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্টি থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন তার মনে করে দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন– বল, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদে জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তকরণসমূহ দিয়েছেন। তোমরা খুব অল্পই শোকর কর'।[৮]

PZ_Z : mvgwqK gwjKvbv gvb‡li :

যদিও সবকিছুর একমাত্র মালিক আলাহ তা'আলা তদুপরি তিনি দয়া করে মানুষের জন্য অনুমতি দিয়েছেন সেসব থেকে উপকৃত হওয়ার, সেসবে হস্তক্ষেপ করার এবং সেগুলোকে নিজের দিকে সম্মন্ধযুক্ত করার। এমনকি তিনি তাদেরকে মালিক বলেও অভিহিত করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– (ক) আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদেরকে (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার।[৯] (খ) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা।[১০] (গ) যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে.....।[১১]

---

[১]. মায়েদা : ১৭
[২]. মায়েদা : ১১৯
[৩]. ফুরকান : ০২
[৪]. সাবা' : ২২
[৫]. নূর : ৩৩
[৬]. জাসিয়া : ১৩
[৭]. লুকমান : ২০
[৮]. মুলক : ২৩
[৯]. বাকারা : ১৮৮
[১০]. আনফাল : ২৮
[১১]. বাকারা : ২৭৪

এসব আয়াতে মালকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সে এর মালিক হিসেবে। হাদিস শরিফে এসেছে– 'কোনো মুমিনের মাল বৈধ হবে না তার হার্দিক সম্মতি ছাড়া।'[১২] এ হাদিসে মালকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সে তার মালিক হিসেবে। তবে এরপরও আসল মালিকানা কিন্তু আলাহরই হাতে। কারণ তিনিই মূল স্রষ্টা; কেউ তাঁর সৃষ্টিতে শরিক হতে পারে না। এর অর্থ, মানুষের দিকে যে মালিকানার সম্বন্ধ করা হচ্ছে তা অস্থায়ী ভিত্তিতে। মানুষ শুধু তার মালিকানাধীন সম্পদে প্রকৃত মালিকের পক্ষে উকিল বা তত্তাবধায়কের ভূমিকা পালনকারী। এ কারণে তার কর্তব্য, নিজ মালিকানাধীন সম্পদে প্রকৃত মালিকের সকল শর্ত ও বিধি-নিষেধ মেনে চলা যা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি হলেন মহান আলাহ। যদি তা লঙ্ঘন করে তাহলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। উপযুক্ত হবে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির। এ শাস্তি হিসেবে কখনো কখনো তার নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়– সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে আবার আংশিক কিংবা পুরোপুরি।

এমনটিই বলেছেন বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ। ইমাম কুরতুবি র. 'এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর।'[১৩] –এর ব্যখ্যায় এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এতে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত মালিকানা আলাহর, তাই বান্দা তাতে সে হস্তক্ষেপটুকুই করতে পারে আলাহ যার ওপর সন্তুষ্ট।' অতপর তিনি বলেন, 'এটি প্রমাণ যে যত সম্পদ আছে তা আসলে তোমাদের সম্পদ নয়, তোমরা এসবের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং তোমাদের পরবর্তীতে এ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার আগেই তা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করো।[১৪] এ বাস্তবতার উপলব্ধিই একজন মুসলিমকে তার হাতে আগত সম্পদরাশি আল-াহর নির্দেশ মত ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে যেখানে খরচ করা উচিৎ সেখানে সে কার্পণ্য করে না। করবে কীভাবে? সে তো মালিক নয়; কেবল তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়কের বৈশিষ্ট্যই তো মালিকের মর্জি মাফিক খরচ করা।

cÂgZ : m¤ú` e¨q Kiv Avjvni cQ›`bxq c‡_ :

মুসলমানকে যতটুকু সম্পদ দেয়া হয়েছে তার কর্তব্য সেগুলোকে আলাহর পছন্দ মাফিক ব্যয় করা। যেন তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আলাহর দাসত্ব পূর্ণ হয়। যদ্বারা সে আখিরাতের সুখময় জীবন লাভে ধন্য হয়। ইরশাদ হয়েছে– আর আলাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।[১৫] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নিজেকে দুনিয়ার হালাল বিষয় থেকেও বিরত রাখতে হবে অথবা শরীরকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস না দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে হবে। আমাদের রব বলেছেন– বল, 'কে হারাম করেছে আলাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিয্‌ক'?[১৬]

lôZ : `wbqv D‡Ïk¨ bq we‡aq :

দুনিয়া কিংবা দুনিয়ার নেয়ামত-সম্পদ মানুষের আসল উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক মাত্র। আসল লক্ষ্য, ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা। অতএব দুনিয়ার উপকরণ ও সম্পদ লাভ হলে যেন আমরা আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই। দুনিয়া বা তার কোনো বস্তুকেই নিজের লক্ষ্য বানিয়ে না নিই। কারণ জুতোর রাখার উদ্দেশ্য তার মধ্যে মানুষের পা রাখা। সওয়ারি প্রাণী পোষার উদ্দেশ্য মানুষ তার পিঠে চড়বে আর সে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। তাই ফিকহে ইসলামি বা সুস্থ জ্ঞান– কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল লক্ষ্য শুধুই জুতো সংগ্রহ কিংবা উদ্দেশ্যহীন নিছক ঘোড়া ক্রয় হতে পারে না। তেমনিভাবে একজন মুসলমানও পার্থিব উপকরণ ও সম্পদ উপার্জন-আহরণ করে কেবল মাধ্যম হিসেবে। যা তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পূরণ সহজ করে। আর এ সব উপকরণ অচিরেই তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। বাকি থাকবে শুধু তাই, যা সে আলাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ব্যয় করেছে। ইসলাম যেভাবে চায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেভাবে পরিচালনা করতে চাইলে এই চেতনার বিকাশ ও তা সদা সমুন্নত রাখার কোনো বিকল্প নেই। কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডের অনুঘটক বা আসল চালিকাশক্তি তাই যা তাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ করে তার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতাকে। আন্তর নিয়ন্ত্রণ যখন সহজ হয়ে যায় বাহ্য নিয়ন্ত্রণ তখন নস্যি। এই বিমূর্ত কথাই কুরআনে উলেখ হয়েছে বারবার। (ক) আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আলাহর কাছে যা আছে তাই উত্তম ও

---

[১২]. মুসনাদে আহমদ : ২০১৭০ দারে কুতনি : ২৯২৪

[১৩]. হাদীদ : ০৭

[১৪]. তাফসিরে কুরতুবি : ৭/২৩৮

[১৫]. কাসাস : ৭৭

[১৬]. আ'রাফ : ৩২

স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না।[১৭] (খ) নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।[১৮] (গ) সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।[১৯]

`B : Bmjvwg A_©bxwZi ˆewkó¨vewj :

আমরা আগেও বলেছি যে ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো, তা মানব প্রকৃতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে, খেয়াল রাখে উন্নত চরিত্র রক্ষার দিকটি। একইসঙ্গে নিশ্চিত করে মানব জীবনের জরুরি প্রয়োজন পুরণ। আসুন সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বৈশিষ্ট্যত্রয় বিশেষণ করি।

c_gZ ; gvbe cKwZi cwZ †Lqvj ivLv :

আলাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে এমন কিছু সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা কখনো তার থেকে বিচ্ছিন্ন বা নির্মূল হবার নয়। তবে যেসব প্রকৃতি কলুষিত বা বিকৃত হলে তার সংস্কার এবং সংশোধন সম্ভব। এ কারণেই যে ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তা কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। টিকে থাকতে পারে না সহজে। ইসলামি অর্থনীতি তাই মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে কারণ ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। আর মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রথমত মানুষের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ মালিকানা লাভে আগ্রহী। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে– আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।[২০] দ্বিতীয়ত উত্তরাধীকার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে। কেননা মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সন্তানদের ভালোবাসে। তাদেরকে সম্পদহীন কপর্দকশূন্যভাবে রেখে যেতে অস্থিরতা বোধ করে। এ জন্যই ইসলাম মিরাছ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। কারণ ইসলাম প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটি ধর্ম। সন্তানদের প্রতি মানুষের টান, তাদের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য এবং নিজের অবর্তমানে তাদের অবস্থা চিন্তা করে ভেতরে অস্থিরতা বোধ করার প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– আর তাদের ভয় করা উচিৎ যে, যদি তারা তাদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আলাহকে ভয় করে এবং যেন সঠিক কথা বলে।[২১] আরো ইরশাদ হয়েছে– তোমাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, আর বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করবে এবং তার জন্য থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানল ঘুর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে গেল? এভাবেই আলাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।[২২]
ইসলাম তার অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কারণ এটাই মানুষের স্বভাব। বরং মানুষের সহজাত চাহিদা হলো, সে তার পরিশ্রমের ফসলে অন্য কারো অংশীদারিত্ব সহ্য করতে পারে না। তবে সে এমন অংশীদারিত্ব সাদরে মেনে নেয় যার বিনিময়ে আলাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়া যায়। মানুষের এ স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে– আর আলাহ রিয্‌কে তোমাদের কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তাদের রিয্‌ক দাসদাসীদের ফিরিয়ে দেয় না। (এই ভয়ে যে,) তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে তারা কি আলাহর নিআমতকে অস্বীকার করেছে?[২৩]
ইমাম কুরতুবি র. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ আলাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে ধনী-গরিব সৃষ্টি করেছেন। যাদেরকে রিজিক দিয়েছেন তারা তাদের গোলামদেরকে রিজিক দিতে চায় না এই ভয়ে যে পাছে মুনিব-ভৃত্য সমান হয়ে যায় কি-না।[২৪] অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা বলেন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে একটি উপমা বর্ণনা করেছেন; আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ বিষয়ে সমান?[২৫]

---

[১৭]. কাসাস : ৬০
[১৮]. কাহ্‌ফ : ০৭
[১৯]. কাহ্‌ফ : ৪৬
[২০]. ফাজর : ২০
[২১]. নিসা : ০৯
[২২]. বাকারা : ২৬৬
[২৩]. নাহল : ৭১
[২৪]. তাফসিরে কুরতুবি : ১০/১৪১
[২৫]. রূম : ২৮

ইমাম কুরতুবি এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, ‘ ’ এখানে ইবতিদা বা শুরু বুঝানোর জন্য এসেছে। যেন তিনি বলছেন, আমি একটি দৃষ্টান্ত দিব আর তা নেব তোমাদের সবচে’ কাছের জিনিস থেকে। তা হচ্ছে তোমাদের অন্তর। ইমাম কুরতুবি বলেন, ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের কেউ কি রাজি হবে যে, তার অধীনস্ত ব্যক্তি সম্পদে-সম্মানে তার সমকক্ষ হোক? কখনো না, এখন ভেবে দেখ তোমরা নিজেদের সম্পদে যখন সমকক্ষ বা অংশীদার বানাতে সম্মত হও না তাহলে কীভাবে আলাহর অংশীদার বানাও?

আর মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছে ইসলামি অর্থনীতির সকল ধারা উপধারা। যাবতীয় মূলনীতি। যেমনটি আমরা সামনে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআলাহ। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ অন্ধের মতো প্রবৃত্তির পিছে ছোটা নয় যে, সে যেদিকেই আর যেভাবেই চলুক না কেন আমিও তাই করব। বরং এর অর্থ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সংস্কারেরও অবকাশ রাখা যখন সে বিকৃত বা বিচ্যুত হয়।

wØZxqZ : PwiwÎK gj¨‡ev‡ai cwZ j¶¨ ivLv :

ইসলামি অর্থনীতি মানুষের চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতিও খেয়াল রাখে। এ জন্য এমনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার অনুমতি কারো নেই যা চারিত্রিক মূল্যবোধ বিরোধী কিংবা এর সীমা অতিক্রমকারী। কারণ ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো পরস্পর সৌহার্দ্য-ভালোবাসা এবং কল্যাণ পথে সাহায্য-সহযোগিতা। আলাহ তা’আলা ইরশাদ করেন– সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।[২৬] অতএব ইসলামি অর্থনীতিতে কোনো হিংসা-দ্বেষ কিংবা ঝগড়া-কলহ সৃষ্টির অবকাশ নেই। এতে প্রশ্রয় নেই মিথ্যা-প্রতারণা অথবা ধোঁকা-বিশ্বাস ঘাতকতার। মানুষের হাতে যখন কোনো সম্পদ থাকবে তা সে মন্দ ও অশীলতার পথে কিংবা অবৈধ দেহ ভোগে ব্যয় করবে সে সুযোগও নেই এখানে। বরং সে তা খরচ করতে বাধ্য বৈধ খাতসমূহে। ব্যয় করবে বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত লোকের প্রতি। ব্যয় করবে নেকি ও পুণ্যের কাজে। তেমনি সে নিজ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে চাইলে এমনভাবে তা করতে পারবে না যাতে মানুষের চরিত্র ধ্বংস হয় কিংবা সমাজের লোকদের পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন হয়। যেমন– মদ্যশালা বা পতিতালয় খোলা, নাইটক্লাব বা সুদি কারবারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

ইসলামি অর্থনীতি চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখে দুইভাবে। (ক) ইমান ও নৈতিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে। যেমন– সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। (খ) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আইনের শাসনের মাধ্যমে। যেমন– রাষ্ট্র কর্তৃক সুদি কারবার, নাইটক্লাব ও মদ্যশালা প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।

ZZxqZ : e¨w³i c‡qvRb ciY wbwðr Kiv :

মানুষের কিছু মৌলিক বা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন রয়েছে যা ব্যতীত তার জীবন ধারণ সম্ভব নয় যেমন– খাদ্য-পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এবং এসবের আনুষঙ্গিক জিনিসগুলোর প্রয়োজন। প্রতিটা মানুষের সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য এসবের ন্যূনতম সরবরাহ জরুরি। ইসলামি অর্থনীতি এ দিকটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। নিশ্চিত করেছে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্ধারণ করেছে ধারাবাহিক বিভিন্ন উপায় ও পর্যায়। যদি কোনো পর্যায় তার জন্য ফলপ্রসূ না হয়; তাহলে তার জন্য একেরপর এক পরবর্তী পর্যায় অবলম্বন করা হবে- যতক্ষণ না তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত হয়। সমাজের প্রতিটি সদস্য লাভ করতে সক্ষম হয় তার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়। পর্যায়গুলো হলো–

GK. প্রতিটি মানুষ নিজে নিজের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও শ্রম নিয়োগে আদিষ্ট। এ জন্যই ইসলাম কর্ম ও উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। প্রশংসা করেছে শ্রম ও চেষ্টা নিয়োগকারী ব্যক্তির। আলাহ তা’আলা ইরশাদ করেন– অতপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল-াহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর।[২৭] হাদিস শরিফে এসেছে– মানুষ তার হাতের উপার্জন থেকে উত্তম কিছু কামাই করে না।[২৮]

`B. রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এমনকি তাদের কর্ম সৃষ্টির জন্য যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাই করতে হবে। প্রখ্যাত ফিকাহ বিশারদ ইমাম আবু

---

[২৬]. মায়েদা : ০২
[২৭]. জুমুআ’ : ১০
[২৮]. ইবনে মাজা : ২১২৯

ইউসুফ র. অভাবী লোককে বাইতুল মাল থেকে কর্জ দেয়ার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ফকিহ ইবনে আবিদিন র. বলেন, 'আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত যে, অক্ষম ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ঋণ দেয়া হবে। অর্থাৎ দারিদ্র হেতু নিজ খারাজি ভূমিতে চাষাবাদ করতে অক্ষম ব্যক্তিকে বাইতুল মাল থেকে কর্জ দেয়া হবে যা দিয়ে সে ভূমিতে চাষাবাদ করে উপকৃত হতে পারে।[২৯]

আবু ইউসুফ র. এর এ কথার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, খারাজি জমির মালিক নয় এমন লোককেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দেয়া যাবে। যাতে সে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে এ থেকে সাহায্য নিতে পারে।

wZb. কেউ যদি নিজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয় তার অক্ষমতা, বার্ধক্য, অসুস্থতা বা কাজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মপদ খালি না থাকার কারণে, তাহলে পরিবারের সদস্যদের ওপর ওয়াজিব তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা।

Pvi. দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তি যদি তার পরিবারে এমন লোক না পায় যে তাকে সাহায্য করবে– বাস্তবে এমন কেউ নাই সেহেতু কিংবা আছে তবে সেও দরিদ্র, তাহলে জাকাতের টাকা থেকে তাকে এতটুকু দেয়া ওয়াজিব যা দিয়ে সে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে। কারণ জাকাত তো দরিদ্রদের অধিকার যা ধনীদের কাছে রয়েছে। আর জাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ অভাবী ও দরিদ্রদের সামাজিক গ্যারান্টির অন্যতম।

পাঁচ. যদি জাকাতের অর্থ এ কাজের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে বাইতুল মালের অন্যান্য আয় থেকে দরিদ্র-অভাবীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো হবে।

ছয়. বাইতুল মালে যদি এতটুকু অর্থ না থাকে যা দিয়ে অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো যায়, তাহলে বিত্তশালীদের ওপর তাদের মৌলিক প্রয়োজন পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফকিহ ইবনে হাযম র. বলেন, 'এবং প্রতিটি শহরের সম্পদশালীদের ওপর নিজ নিজ শহরের অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে এগিয়ে আসা ফরজ। যদি তারা এ গুরুদায়িত্ব পালনে গাফিলতি করে তাহলে শাসক তাদেরকে চাপ দিবে। সেহেতু জাকাতের অর্থ পর্যাপ্ত না হলে তাদের অন্তত এতটুকু সম্পদ দিতে হবে যা দিয়ে খেয়ে জীবন বাঁচাতে পারে, এতটুকু পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে যা দিয়ে শীত এবং লজ্জা নিবারণ করতে পারে। এবং মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যা তাকে রক্ষা করবে শীত- গরম ও বৃষ্টি এবং পথচারীদের দৃষ্টি থেকে।[৩০]

'ধনীদের সম্পদে যে জাকাতই একমাত্র গরিবদের হক নয়' ইবনে হাযমের এ উক্তিকে সপ্রমাণ করে এমন বর্ণনা যে, উম্মুল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা. ও ইবনে উমর রা. ছাড়াও বেশ ক'জন সম্মানীত সাহাবি বলেছেন, 'ধনীদের সম্পদে জাকাত ছাড়াও হক রয়েছে গরিবদের।' [৩১]

কুরআনের আয়াত 'ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আলাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে ।[৩২]– এর আলোচনায় গিয়ে ইমাম কুরতুবি এবং ইমাম রাযি বলেন, এ আয়াতে সম্পদ ব্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য, জাকাত ভিন্ন অন্য মাল। আর তা কিন্তু ওয়াজিব দানের অন্তর্ভূক্ত; নফল দানের মধ্য থেকে নয়। ইমাম রাযি এ ধরনের ওয়াজিব দানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন– অসহায় লোককে অন্ন দান। এরপর তিনি বলেছেন, 'আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জাকাত আদায়ের পরও যখন মুসলমানদের অতিরিক্ত প্রয়োজন থাকবে, তো সেখানে সম্পদ ব্যয় করা ধনীদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক র. বলেন, মুসলমানদের ওপর যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ দেয়া ওয়াজিব যদিও এর জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে হোক না কেন। এটি একটি সর্বসম্মত মাসআলা।[৩৩]

এরই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যদি বাইতুল মালে পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকে তাহলে মুসলিম শাসক বিত্তশালীদের সম্পদে ইনসাফপূর্ণভাবে করারোপ করে দরিদ্রদের অবশ্য প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারেন। যাতে অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো যায়। এ দিয়ে রাষ্ট্র সেসব দায়িত্ব পালন করতে পারে যা তার জনগণের করণীয় এবং সে দায়িত্ব যা তাকে পালন করতে হয় জনগণের পক্ষ থেকে। যেমন– সীমান্ত সুরক্ষা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরি ইত্যাদি। আমাদের এ দাবিকে দৃঢ়তা দান করে নবীজির সা. বিখ্যাত সেই হাদিস– 'তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সে দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৩৪] ইমাম নববি র. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আলেমগণ বলেছেন, রাখালের দায়িত্ব হচ্ছে,

[২৯]. রদ্দুল মুহতার : ৩/৩৬৪
[৩০].মুহালা : ২/১৫৬
[৩১]. মুহালা : ২৫৮
[৩২]. বাকারা : ১৭৭
[৩৩]. কুরতুবি : ২৪১, তাফসিরে : ৫/২৪
[৩৪]. মুসলিম : ৩৪০৮

বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার পরিচালনাধীন প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেসবের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর থাকা। এ থেকেই প্রতীয়মান যে, কারো অধীনে বা তত্ত্বাবধানে কেউ থাকলে তার সঙ্গে ইনসাফ রক্ষা করা এবং তার দীন-দুনিয়ার কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকার ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৫]
বস্তুত প্রতিটি মুসলমানের কাছে প্রত্যাশা হলো, বাইতুল মালে পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে তারা দরিদ্র-অভাবী এবং রাষ্ট্রের সহযোগিতায় অর্থ ব্যয়ে প্রতিযোগিতা করবে। যা তাদের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় আলাহর পথে ব্যয়কারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। নিন্দা করা হয়েছে কৃপণ ও কৃপণতার। সতর্ক করা হয়েছে কৃপণতার মতো ঘৃণ্য স্বভাবের। আর এ সবই মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে দান ও দানশীলতার প্রতি।
অনুরূপ সুন্নাতে নাববিয়াতেও আলাহর পথে ব্যয় করতে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এর নির্দেশ-উপদেশ দেয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। সেসবের মধ্য থেকে এখানে শুধু আবু সাইদ খুদরি রা. বর্ণিত হাদিসটি উলেখই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বলেন, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন– 'যার কাছে অতিরিক্ত একটি বাহন আছে সে যেন তা দিয়ে দেয় তাকে যার বাহন নাই। যার কাছে সফরের পাথেয় রয়েছে সে যেন তা দিয়ে দেয় যার পাথেয় নাই তাকে।' আবু সাইদ খুদরি বলেন, এভাবে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম একটার পর একটা সম্পদের নাম উলেখ করতে থাকলেন। এমনকি আমরা দৃঢ়ভাবে বুঝে নিলাম যে অতিরিক্ত কিছুতেই আমাদের হক নাই।[৩৬] সুতরাং ধনীরা যদি নিজ উদ্যোগেই তাদের কাছে প্রত্যাশিত দান না করে তাহলে শাসকের জন্য জায়িজ আছে এ পরিমাণ সম্পদ আহরণে ন্যায়ানুগ ট্যাক্স আরোপ করা যা দিয়ে অভাবীদের অভাবও মোচন হয় আবার রাষ্ট্রের প্রয়োজনসমূহও পুরণ করা যায়।

Bmjvwg A_©bxwZi mvaviY bxwZgvjv :

ইসলামি আকিদা, মানব প্রকৃতি ও জনকল্যাণ ভিত্তিক পরিচালিত ইসলামি অর্থনীতির বেশ কিছু সাধারণ নীতিমালা রয়েছে। আর যেসবের রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা এবং বিচিত্র বিন্যাস। এসব নীতিমালার মধ্য থেকে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আলোচনার প্রয়াস পাব। সেগুলো হলো- কর্মের স্বাধীনতা, ব্যক্তি মালিকানার অধিকার এবং উত্তরাধিকার বা মিরাছ।

K‡gi ¯^vaxbZv:

ইসলাম কর্মে উৎসাহ দেয়। অপছন্দ করে আলস্য ও অক্ষমতা। আর মর্যাদার দিক দিয়ে সবচে' বড় ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সেটি যা আলাহর নৈকট্যশীল বানায়। যেমন– নিরেট ইবাদত যথা- সালাত। এবং সেসব বৈধ কাজ যা সৎ নিয়তে সম্পাদিত হয়। যেমন– শিল্প ও কৃষিকাজ।
উপার্জন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলাম শ্রমেই বেশি উৎসাহ দেয়। শ্রমিকের উপার্জনে দেয়া হয় বরকত। চেষ্টা ও হালাল উপার্জনের প্রশংসায় আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অতপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আলাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর।[৩৭] আরো ইরশাদ হয়েছে– তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্‌ক থেকে তোমরা আহার কর আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।[৩৮]
হাদিস শরিফে এসেছে, 'মানুষ সহস্তে উপার্জিত রুজির চেয়ে উত্তম কিছু ভক্ষণ করে না।'[৩৯] অপর এক হাদিসে এসেছে– 'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে রাত্রি যাপন করে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েই রাত কাটায়।'
আর কর্মে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ ধরনের কোনো কাজে নয়; যে কোনো কাজে। শর্ত শুধু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা হালাল হতে হবে। এ উৎসাহের আওতায় রয়েছে হালাল উপার্জনের সম্ভাব্য সকল কর্মকাণ্ড এবং সব রকম লেনদেন। যেমন– ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, যৌথ কারবার, মুদারাবা, ইজারা এবং সব ধরনের কাজ ও তৎপরতা যা মানুষ হালাল উপার্জনের জন্য অবলম্বন করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো হালাল কাজ করলেই মানুষের মর্যাদা কমে না; লোকে সেটাকে যতই তুচ্ছ জানুক না কেন। কুরআনের বক্তব্যের আলোকে মানুষের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড তাকওয়াহ ও দিনদারি। তার

[৩৫] . লু'লু' ওয়াল মারজান : ২/২৮৪
[৩৬] . মুহালা ৬/১৫৫-১৫৭, মুসলিম : ৩২৫৮
[৩৭] . জুমুআ' : ১০
[৩৮] . মুলক : ১৫
[৩৯] . বুখারি : ১৯৩৫

সম্পদ ও প্রাচুর্য কিংবা পেশা ও কর্ম নয়। এজন্য আমরা এ উম্মতের মহান পূর্বসুরী আলেম, ফকিহ ও বুযুর্গদের দেখতে পাই তারা কোনো কোনো কাজে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দিয়েছেন।

ইসলাম পরোক্ষভাবে কর্ম ও উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তা হলো, দরিদ্রকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করেছে এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিকে নেকি লাভের দিক দিয়ে সাহায্য গ্রহীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করেছে। হাদিসে এসেছে– 'উঁচু হাত নিচু হাতের চেয়ে উত্তম।'[৪০] তেমনি জাকাত, হজ্ব ও বিভিন্ন ইবাদত এবং আলাহর পথে ব্যয়ের বড় নেকি রাখা হয়েছে। এসব নেকি অর্জন সম্ভব নয় হজ ও জাকাতের উপকরণ অর্জন ছাড়া। আর উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে না অর্থ-সম্পদ ছাড়া। এদিকে সম্পদ আহরণ ও জীবিকা উপার্জনের মূল হলো শ্রম ও চেষ্টা ব্যয়। তাই বলা যায়, কর্ম নেকি অর্জনের মাধ্যম কেননা কর্মই অর্থ লাভের উপায়। আর অর্থ ব্যয় আলাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পুণ্য লাভের মাধ্যম। এ কারণেই হাদিস শরিফে এসেছে- 'কতইনা চমৎকার সৎ লোকের পবিত্র সম্পদ।'[৪১] কারণ নেককার ব্যক্তি তার বৈধ সম্পদ আলাহর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করে আলাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

উপযুক্ত কাজ বাছাইয়ের দায়িত্ব ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে ব্যক্তির ওপর। ব্যক্তিকে কর্ম বাছাই বা কাজ পছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছে। অবারিত করেছে তার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সুতরাং তার অধিকার রয়েছে সে যে কাজ ইচ্ছে পছন্দ করবে। এ ব্যাপারে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। কিংবা বাধ্যও করা যাবে না। শরিয়তের কোনো উদ্ধৃতিই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তির কাজ বাছাইয়ের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না।

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা নির্ভর করবে মানব প্রকৃতি এবং তার সম্মান ও ব্যক্তিত্ববোধ, তার সম্পাদ্য ব্যক্তিগত কার্যভার বা দায়িত্ব ও সবার কল্যাণের প্রতি মনযোগের ওপর। এর ব্যাখ্যা হলো, জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই গমন-প্রস্থান এবং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। তাই এ সুস্থ স্বভাবজাত টানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। একটা অবলা প্রাণীও তো তার স্বভাবে স্বাধীনতার প্রতি এমন টান উপলব্ধি করে।

হ্যা, এই স্বভাব কখনো বেয়াড়া-বিকৃত হয়ে পড়ে। মানুষ তখন অনিষ্ট ও ক্ষতিকর এবং অক্ষম জিনিস গ্রহণ করে যা হারাম; হালাল নয়। তখন জরুরি হয়ে পড়ে তা ঠিক করে দেয়া এবং স্বাধীনতার রাশ টেনে ধরা। যেন তার স্বাধীনতা হারামের চোরাগলি ত্যাগ করে হালালের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।

এ ছাড়া কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দানের মাঝে মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে। কারণ মানুষ স্বভাব-স্বাধীন। স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী সে। তার স্বাধীনতা অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্ন। তাকে অন্যসব প্রাণীর সমান করা যাবে না- যাদেরকে পরিচালক যে দিকে চালায় সেদিকেই চলে। অতএব মানুষের স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করা যাবে না। কর্ম ও উপার্জনের ব্যাপারেও অপ্রয়োজনে বাধা যাবে না তার হাত যা চায় তা আহরণ থেকে। কারণ এ নগ্ন হস্তক্ষেপ তার শ্রেষ্ঠত্ব চেতনার পরিপন্থী।

এ দিকটি কিন্তু আমাদের ফিকহ বিশারদগণও আমলে নিয়েছেন। এমনকি ইমাম আবু হানিফা র. অর্বাচীন ভেদ-বুদ্ধিহীন আনাড়িকে ঘরে বন্দি রাখা অবৈধ বলেছেন। তাঁর যুক্তি, এতে করে মানুষ হিসেবে তার যে শ্রেষ্ঠত্ব তার অবমাননা করা হয়। আর মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব কেড়ে নেয়া তার সম্পদ ধ্বংসের চেয়েও বড় ক্ষতি। এখানে এমন যুক্তি দেখানো সঙ্গত হবে না যে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে রাষ্ট্রের কাঁধে সবার কর্ম নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করাই ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য কল্যাণকর। কারণ মানুষের শুধু রুটি-ভাতই প্রয়োজন নয় যা সে গোগ্রাসে গিলবে আর উদর পূর্তি করবে। বরং তার জন্য স্বাধীনতার কোমল বাতাসও দরকার যা দিয়ে সে আত্মা ও অনুভূতি এবং মানবিক উপলব্ধিকে পূর্ণতা ও প্রশান্তি দিবে। এ জন্যই মানুষের কর্মের স্বাধীনতার বিষয়টি স্থির করা জরুরি। মানুষের কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা এটাই আসল আর স্বাধীনতাকে শর্তযুক্ত বা খর্ব করাটা ব্যতিক্রম।

কর্মের স্বাধীনতা দানের মধ্যে তেমনি এ উদ্দেশও রয়েছে যে এর দ্বারা মানুষের প্রতিভা এবং তার যোগ্যতা ও সামর্থ বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রতিটি মানুষ তার রুচি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখেই কর্ম বাছাই করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কর্মে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। ফলে তার সৃজন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কাজে বরকত হয়। আর এতে সার্বিকভাবে উপকৃত হয় সমাজ- যেখানে সে বাস করে। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তি মানুষের কর্মের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। কর্ম বাছাইয়ের ভার ছেড়ে দেয়া হয় রাষ্ট্রের ওপর তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি তার রুচি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই কর্ম-পদ খুঁজে পাবে না। এতে অপমৃত্যু ঘটবে তাদের প্রতিভার।হ্রাস পাবে তাদের কর্মোদ্দীপনা। তখন তারা কাজে যোগ দিবে একরকম বাধ্য ও নিরূপায় হয়ে। এতে কাজের রেজাল্ট আসবে কম। লোপ পাবে তাদের সৃজন-ক্ষমতা। এর বিরূপ প্রভাব পড়বে তাদের এবং সমাজের

---

[৪০]. বুখারি : ১৩৩৮, মুসলিম : ১৭১৫

[৪১]. বাইহাকি: শুআবুল ইমান : ১২৪১

ওপর। এছাড়া মানুষ আপন দায়িত্বভার ও তার পছন্দ ও অপছন্দ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসিত হবে। তাই কর্ম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া ইনসাফের দাবি।

আমরা যে কর্মের স্বাধীনতার কথা বললাম তা তো বল্গাহীন নয়। যখন প্রয়োজন পড়বে– এ স্বাধীনতা সমাজের অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা এ স্বাধীনতা গ্রহণের আড়ালে সমাজের অনিষ্ট সাধন বা অন্য কোনো কুমতলব থাকবে তখন সর্ব সাধারণকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সরকার অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। এরই ভিত্তিতে ফিকাহবিদরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকহারে বাড়িয়ে দেয় তাহলে শাসকের জন্য পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয়া বৈধ বলেছেন। তেমনি ন্যায্য বেতন-ভাতা না পেয়ে কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা যদি কাজ বর্জন করে ধর্মঘট করতে লাগে, তাহলে জনস্বার্থে সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য ভাতা ও বেতন নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

ব্যক্তিকে কর্মের স্বাধীনতা দানের ফল হলো, উত্তম ইসলামি চরিত্রের আওতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গণে স্বাধীন ও সুস্থ প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি। সবার জন্য সমান সুযোগ রয়েছে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিগুণ শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োগের। তবে শর্ত হলো নৈতিক মূল্যবোধের বাইরে যাওয়া যাবে না। এ জন্যই স্বাধীন প্রতিযোগিতার নামে ধোঁকা-প্রতারণা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বা দরপতন ঘটানো যাবে না। কাউকে ঠকানো যাবে না। কারণ এটা মানুষের মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা কম-বেশির অপরিহার্য পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–... আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।[৪২]

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে রিজিক তথা দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতায় তারতম্য সৃষ্টি করেছেন যেন একে অপরকে জীবিকা উপার্জনের উপায়গুলোতে ব্যবহার বা অনুগত করে সবাই সবার সকল প্রয়োজন পুরা করতে পারে।' আর আল্লাহ তা'আলা এই তারতম্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্নভাবে যা মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। যেমন– প্রতিভা ও যোগ্যতার মাঝে পার্থক্য। কখনো এ তারতম্য পুরোপুরিভাবে দূর করা সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব এবং কাম্য যে দুর্বলকে সবলের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে– ইসলাম এটাই বলেছে এবং এরই প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এটাকে কার্যকর করার জন্য গ্রহণ করেছে বিভিন্ন উপায়।

e¨w³ gvwjKvbvi AwaKvi :

এটি একটি স্বতসিদ্ধ বিষয় যা শরিয়ত সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখে এমন ব্যক্তিও জানে যে, ইসলাম মানুষের ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির বদৌলতেই মানুষ সম্পদের মালিক হতে পারে। ইরশাদ হয়েছে– আর তারা কি দেখেনি, আমার হাতের তৈরী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা হল এগুলোর মালিক।[৪৩]

সুতরাং জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জন্য তার মালিকানা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন– আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।[৪৪] এ আয়াত মানুষের ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করছে। এখানে মাল বা সম্পদকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর সম্বন্ধ সূচক পদটি বিশিষ্টতার অর্থ দিচ্ছে যা তার মালিকানা প্রমাণ করছে। আরো ইরশাদ হয়েছে– (ক) আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়।[৪৫] (খ) আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে তার সম্পদ দান করে আত্ম–শুদ্ধির উদ্দেশ্যে।[৪৬] (গ) তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না।[৪৭] এসব এবং ইত্যাকার অন্যসব আয়াতে সম্পদকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে যা দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়।

সুন্নাতে নাববিয়াতেও অনেক হাদিস মেলে যা একে স্বীকৃতি দেয়। যেমন– 'কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না কারো মাল তার মনের স্বতস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া।'[৪৮] এ ছাড়াও ইসলামে এমন কিছু বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যার ভিত্তি ব্যক্তি মালিকানার ওপর। যেমন– মিরাছ, জাকাত, বিবাহের মোহর এবং অন্যান্য খরচ।

[৪২]. যুখরুফ ; ৩২
[৪৩]. ইয়াসীন : ৭১
[৪৪]. বাকারা : ২৭৯
[৪৫]. বনী ইসরাঈল : ৩৪
[৪৬]. লাইল : ১৭-১৮
[৪৭].লাহাব : ০২
[৪৮]. মুসনাদে আহমদ : ২০১৭০ দারে কুতনি : ২৯২৪

কেননা ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার না করলে মিরাছের কোনো অর্থই থাকে না। আবার জাকাতের ফরজ বাস্তবায়নও সম্ভব নয় সত্ত্ব বা মালিকানা ছাড়া।

শরিয়তের যেসব প্রমাণাদি ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে তার মধ্যে সব ধরনের মাল বা সম্পদই অন্তর্ভুক্ত। চাই সে সম্পদ স্থাবর বা অস্থাবর হোক, খাদ্যদ্রব্য বা অন্যকিছু কিংবা চাই তা প্রাণী বা উদ্ভিদ হোক। উৎপাদনের মাধ্যম হোক চাই ধ্বংসের– মালিকানার অধিকার সম্পদের এতসব প্রকারের সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আয়াত ও হাদিসগুলোতে যে মালিকানাকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা শর্তহীনভাবে। কোনো রূপ তারতম্য না করে। শুধু ওই সব ছাড়া যেগুলোর মালিকানা লাভ হারাম হওয়া স্বতন্ত্র নসের মাধ্যমে জানা গেছে। যেমন– মদ ও শূকর। অথবা জিনিসটি হালাল কিন্তু তার মালিক হওয়ার পদ্ধতিটা হারাম। যেমন–চুরি, ছিনতাই অথবা আত্মসাৎকৃত সম্পদ।

ইসলাম শুধু ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতিই দেয়নি তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নিয়েছে। সবার জন্য অত্যাবশ্যক করেছে এর প্রতি সম্মান দেখানো এবং বৈধ কোনো কারণ ছাড়া এতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। ইরশাদ হয়েছে– তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।[৪৯] হাদিসে এসেছে– 'কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না কারো মাল তার মনের স্বতস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া।'[৫০] যে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবে। হস্তক্ষেপ করবে অন্যের মালিকানায় তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছে। যেমন–চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ ও ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধের 'হদ', 'তাযির' ইত্যাদি শাস্তি ঘোষিত হয়েছে।

তবে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ইসলাম ব্যাপারটিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে। ইসলামের অবস্থান এ ক্ষেত্রে প্রহরীর ন্যায়। বাস্তবতা হলো, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছে, একে রক্ষা করেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি নানা বিধি-নিষেধও দাঁড় করিয়েছে। ইসলাম এভাবেই ব্যক্তি মালিকানার দুই প্রান্তিক অবস্থানের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছে। একদিকে একে স্বীকৃতি ও সুসংহতি দিয়েছে, অপরদিকে বিধি ও সীমা নির্ধারণ করেছে। নিচের পয়েন্টগুলো আলোচনা দ্বারা আমরা এ দু'টি দিক বিশেষণ করব।

এক. ব্যক্তি মালিকানার অধিকার সৃষ্টির দিক দিয়ে:

ইসলাম শর্ত দিয়েছে মালিকানার অধিকার সৃষ্টি হতে হবে শরিয়ত অনুমোদিত উপায়ে। যদি শরিয়ত সম্মত উপায়ে সৃষ্টি না হয় তাহলে ইসলাম তার স্বীকৃতি দেয় না। তা সংরক্ষণও করে না। বরং তা দখলকারীর অধিকার থেকে নিয়ে বৈধ মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। যদি মালিককে খুঁজে বের না করা যায় তাহলে বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। আর সত্তাধিকার অর্জনের শরিয়ত সম্মত পথ তিনটি। যথা–

(ক) বৈধ মালের ওপর কর্তৃত্ব লাভ। যেমন– শিকার, মৃত বা পতিত ভূমিকে আবাদ, ঘাস বা ঝোপঝাড়ের ওপর কর্তৃত্ব লাভ কিংবা খনি বা গুপ্তধন আবিষ্কারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। তবে এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হবে শরিয়ত নির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

(খ) বিনিময় চুক্তি ও লেনদেন। যেমন– কেনাবেচা, দান, অসিয়ত, ইজারা, মুদারাবা, মুযারা'আ বা বর্গাচাষ ইত্যাদি।

(গ) মিরাছ। কেননা ওয়ারিশ তার উত্তরাধিকারের হকদারকে নিজের রেখে যাওয়া মালিকানায় শরিয়ত নির্ধারিত বিশুদ্ধ পন্থায় প্রতিনিধি বানিয়ে যায়। সেসব পন্থা ও অংশ নিয়ে শর্তসহ সবিস্তার আলোচনা রয়েছে ফিকহের কিতাবগুলোতে।

এগুলো হলো ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টির শরিয়ত অনুমোদিত উপায়। অতএব কেউ যদি এসব উপায়ে মালিকানা লাভ করে তাহলে ইসলাম তার স্বীকৃতি দিবে। এ ব্যাপারে তার মান (ছঁধষরঃু) বা পরিমাণ (ছঁধহঃরঃু) কোনোটাই বিবেচ্য নয়। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারে ইসলামে লক্ষণীয় এর বৈধতা; সংখ্যা বা গুণগত মান নয়। দেখা হবে মালিকানা লাভের উপায়টি কেমন। যদি তা হয় শরিয়তসিদ্ধ তাহলে তার মালিকানা শরিয়তসম্মত এবং শরিয়ত কর্তৃক সংরক্ষিত। এ জন্যই ইসলাম অনেক বেশি মালিকানা সংরক্ষণ করে যদি তার উপায় বৈধ হয়। অথচ অল্প মালিকানা সংরক্ষণ করতেও অস্বীকৃতি জানায় যদি তা অর্জনের উপায় হয় অবৈধ। বিশাল বিস্তৃত ভূমির মালিকানাও স্বীকার করে যখন তা অধিকারের উপায় বৈধ হয়। পক্ষান্তরে এক বিঘত পরিণাম ভূমির মালিকানা স্বীকারেও অস্বীকৃতি জানায়- যদি সেটা হয় আত্মসাৎকৃত। কারণ আত্মসাৎ মালিকানা লাভের কোনো বৈধ পন্থা নয়।

দুই. মালিকানার স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধির শর্তের দিক দিয়ে:

ইসলাম মানুষের সম্পদে হক রেখেছে। যথাযথভাবে এসব হক আদায় ওয়াজিব করেছে। যেমন– জাকাতের হক এবং শরিয়ত নির্ধারিত অন্যান্য খরচ। যেমন শর্তগুলো প্রতিভাত হয় মালিকানা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। সুতরাং

---

[৪৯]. নিসা : ২৯

[৫০]. মুসনাদে আহমদ : ২০১৭০ দারে কুতনি : ২৯২৪

দেখা যায়, ইসলাম সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার মধ্য থেকে ব্যবসায় বাণিজ্য, চাষাবাদ, যৌথ কারবার উলেখযোগ্য।

এ জন্য ইসলাম হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদের বৈধতা দেয় না। যেমন–সুদ, মদ বিক্রি, জুয়া, হাউজি ইত্যাদি হারাম কারবার থেকে উপার্জিত অর্থ। এসব হারাম পন্থায় অর্জিত প্রবৃদ্ধি ইসলামের দৃষ্টিতে অসুস্থ লোকের ফুলে যাওয়া দেহের ন্যায়, মূর্খরা যেটাকে মোটা হওয়া মনে করে। অথচ ডাক্তার ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টিতে সেটি এক আপদ এবং রোগ যা থেকে পরিত্রাণ জরুরি।

তিন. মালিকানাধীন সম্পদ ব্যয়ের শর্তের দিক দিয়ে:

ইসলাম সম্পদ ব্যয়ের শর্ত দিয়েছে যে তা করতে হবে ন্যায়ানুগভাবে। ইরশাদ হয়েছে– খাও, পান কর ও অপচয় কর না।[৫১] আরো ইরশাদ হয়েছে– আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।[৫২] আর খরচে ন্যায়ের প্রতি যে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে তা বৈধ খাতে খরচের বেলায়। যেমন– আহার-পোশাকের মত মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি। নয়তো অবৈধ স্থানে ব্যয়; তা অল্পই হোক আর বেশি– সবই নিষিদ্ধ। অতএব হারাম স্বাদ আস্বাদনে ব্যয় করা বৈধ নয়। যেমন– যেনা, মদ, নৃত্য বা পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি কাজে ব্যয়– যেমন আলাহ ও আখিরাত বিমুখ বিলাসী লোকেরা করে থাকে। আর এ সবের কারণে সমাজে ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বিকৃত দলের প্রকাশ ঘটে যারা এসব হারামে লিপ্ত হয়ে সমাজে অশান্তি ডেকে আনে।

চার. জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজনে ইনসাফপূর্ণ প্রতিদান দিয়ে মালিক থেকে সত্তাধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ফুকাহায়ে কিরাম এমন প্রয়োজনের উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন– সর্বসাধারণের চলাচলের পথ সম্প্রসারণের জন্য মালিকানা নিয়ে নেয়া বৈধ। তেমনি বাধ্যতামূলক মালিকানা বিক্রি করে দেয়া বৈধ যদি তার ওপর অন্যদের বৈধ পাওনা থাকে।

DËiwaKvi jv‡fi AwaKvi:

ইসলামি শরিয়ত নির্ধারিত সম্পদ লাভের অন্যতম উৎস উত্তরাধিকারের হক। মানুষ যখন মরে যায়। রেখে যায় কিছু সম্পদ তখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার উত্তরাধিকারী হয় তার নিকটাত্মীয়রা। মিরাছের সব শর্ত ও কারণ পাওয়া গেলে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হকদাররা নির্ধারিত অংশ লাভ করে শরিয়তে ইসলামি নির্ধারিত নিয়মানুসারে।

উত্তরাধিকারের এই হক প্রবর্তন করা হয়েছে মানব প্রকৃতি, ইনসাফ এবং মালিকের ইচ্ছা প্রতি সম্মান দেখিয়ে। এর দ্বারা মানুষ অধিক শ্রম নিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়। এক পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে; একস্থানে জমা হয়ে থাকে না। এ উত্তরাধিকার ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

এ অধিকার স্বভাব ও ফিতরাতের ভিত্তিতে। আমরা আগেই বলেছি যে, মানুষের স্বভাব, সে তার সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল হয়। সে তাদেরকে কোনো সহায় সম্পত্তিহীন রেখে যাওয়ার সম্ভাবনায় অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা বোধ করে। তাদের জন্য এতটুকু সম্পদ রেখে যেতে সে সচেষ্ট থাকে যা দিয়ে তার বর্তমানে ও অবর্তমানে তারা স্বস্থি ও নিরাপত্তা বোধ করে।

এ অধিকার থাকা ইনসাফেরও দাবি। কেননা মানুষ তার জীবদ্দশায় নিজ সন্তানাদি ও পরিবারস্থ সদস্য যাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে। যেমন– তার মা-বাবা এবং স্ত্রী। এমনকি তাকে এ খরচ যোগাতে বাধ্য করা হবে যদি সে দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য এ দায়িত্ব পালন করাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ইনসাফের দাবি, মৃত্যুর পরও তার সম্পত্তি তাদের জন্য বরাদ্দ হওয়া সে যাদের অস্তিত্বের কারণ। যেমন– তার সন্তানাদি কিংবা তারাই তার অস্তিত্বের কারণ। যেমন– পিতা-মাতা। যাতে করে তারা তার অবর্তমানেও তার জীবৎকালের ন্যায় এ সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে।

মিরাছ মালিকের ইচ্ছার প্রতি সম্মান। কেননা মানুষ তীব্রভাবে কামনা করে মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিক হবে অন্য কেউ নয় তারই নিকটজনেরা। ইসলাম এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছে। এসব আত্মীয়জনের অংশ বর্ণনা করেছে ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ পদ্ধতিতে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যে, প্রতিটি মুসলমান চাইবে, তার সম্পদ শরিয়তের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের নিয়মে বণ্টিত হোক।

আর মিরাছ মানুষকে অধিক শ্রম ও চেষ্টা নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে তা তো স্বতসিদ্ধ বিষয়। কারণ মানুষ শুধু নিজের জন্যই উপার্জন করে না। পরিবারস্থ যাদের সে ভরণ-পোষণ করে তাদের জন্যও শ্রম দেয়। তাই সে

---

[৫১]. আ'রাফ : ৩১

[৫২]. ফুরকান : ৬৭

নিজ চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে নিজের সঙ্গে তাদের প্রয়োজনও মেটাবার জন্য। আর সে তাদের বর্তমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেমন কাজ করে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তেও তার চেষ্টা। যদি সে নিজে বেঁচে থাকে তবে তো নিজেই তাদের প্রয়োজন মেটাবে আর যদি মরণ এসে যায়, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজন মেটাবে। এ জন্যই উত্তরাধিকারের এই নিয়ম যদি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, তাহলে মানুষের উদ্যম মিইয়ে যাবে। স্তিমিত হয়ে যাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ড। সে ভাববে, যাদের ভালো-মন্দের চিন্তায় সে বিভোর তারা তো এসব ভোগ করতে পারবে না। আর এ কথা বলাইবাহুল্য যে, এমন হলে মানুষের কর্মোদ্দীপনা ও শ্রম হ্রাস পাওয়ার কারণে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি আশংকাজনকহারে কমে যাবে। ফলে সমাজ শিকার হবে অপূরণীয় ক্ষতির।

মিরাছ পরিবারস্থ লোকদের জন্য এক সামাজিক গ্যারান্টি। মানুষ মারা গেলে তার জীবিত নিকটজনেরা এর সত্তাধিকারী হয়। এতে করে এতিম, শিশু ও বিধবারা চরম অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা পায়। তারা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। এতে করে রাষ্ট্রের কাঁধ থেকে এদের পালন-পোষণের দায়িত্ব নেমে যায়।

মিরাছ সম্পদ ছড়িয়ে দেয়। গুটিকয়েক লোকের হাতে তা স্তূপীকৃত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। কারণ মানুষ মরে যাওয়ার পর তার বিরাট সংখ্যক নিকটাত্মীয়র মাঝে তা বণ্টিত হয়ে যায়। এদিকে মানুষ যেহেতু চিরঞ্জীব নয়; অবশ্য মরণশীল। তার জীবন নাতিদীর্ঘ । সে বাঁচে মাত্র কয়েক দশক। তাই যে সম্পদ সে সঞ্চয় করেছে অবশ্যই তা ছড়িয়ে যাবে। আর ইসলাম তো সম্পদের বিস্তারই চায়।

জানা দরকার ইসলামের মিরাছ বা সম্পদ বণ্টন নীতিমালা খুবই ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ্ম অন্য কোনো ধর্মে যার উপমা নেই। এতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে, আবার তার প্রয়োজন ও খরচাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এরই আলোকে আত্মীয়দের নির্ধারিত অংশ কম-বেশি করা হয়েছে। যার দৃষ্টান্ত ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দেয়া। ইরশাদ হয়েছে– আলাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।[৫৩] কারণ মেয়ের তুলনায় ছেলের সম্পত্তির প্রয়োজন বেশি। তার ওপর অর্পিত হয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব। বিবাহে পুরুষকেই মোহর দিতে হয়; নারীকে দিতে হয় না। স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও পালন করতে হয় তাকেই। তাই ইনসাফের দাবি, তার অংশ আপন ভগ্নীর চেয়ে দ্বিগুণ হওয়া।

mgvß

৫৩ . নিসা : ১১